নিজের কথা

প্রীতি বন্দোপাধ্যায়

অবিভক্ত বাংলাদেশের রাজশাহীতে আমার জন্ম ১৯২২-এর ৪ঠা ডিসেম্বর। দাদু কুমুদনাথ সরকার, বাবা নরেন্দ্র নাথ সরকার আর মা জ্যোৎস্নারানী সরকার ।



খুকুর আয়না

ছবিটি ছোটদের মসিকপত্রিকা মৌচাক এ প্রকাশিত হয়েছিল

ছোটবেলা থেকেই আমরা খুব খোলামেলা পরিবেশে মানুষ। বিরাট নদী, তার চরে গিয়ে হৈ হৈ করা, নৌকায় চড়ে গান করা, ছোটবেলার এসব কথা বেশ মনে আছে।

আমার দাদুরা ছিলেন সাত ভাই।

(এঁদের ই একজন হলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার।)

বিশাল পরিবার । একই কম্পাউন্ডের মধ্যে আলাদা আলাদা বাড়িতে তাঁরা

বাস করতেন। রাজশাহীতে এই পরিবারে থেকেই মানুষ হয়েছি। তখন সাম্প্রদায়িকতার কথাও শুনিনি, রাজনীতির কথাও তেমন জানতাম না। অবশ্য মার সঙ্গে মুকুন্দ দাসের গান শুনতে গিয়েছি, সে কথা মনে আছে। একজন ভদ্রলোক, ভীষণ মোটাসোটা, অনেক মেডেল গলায় ঝোলানো আর ভীষণ জোরালো গলায় গান গাইছেন - ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি বঙ্গনারী.... । তখন আমার আট বছর বয়স হবে বোধহয়।

খুব ছোটবেলায় -এক কি দেড় বছর বয়সে - আমার বাবা কে হারাই।

বাবা খুব ভাল গান গাইতেন । রজনীকান্ত সেন বাবার বন্ধু ছিলেন। মার কাছে শুনেছিলাম রজনী সেন আমাদের বাড়িতে আসতেন। মা কে বাবা গান শিখিয়েছিলেন। মা ও গাইতেন। ছোটবেলা থেকেই গান শোনার আগ্রহ আমার - মা'র সঙ্গে এখানে, ওখানে কীর্তন শুনতে যেতাম. রোজ সন্ধ্যাবেলায় মা গান গাইতেন। তখন আমাদেরও পাশে নিয়ে বসতেন ।



ছোটবেলার দুটো ঘটনা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে।



তখন আমার ছয় কি সাত বছর বয়স হবে, রাজসাহী স্টেশনে কোন এক আত্মীয়কে সি অফ করতে গিয়েছিলাম | সেখানে দেখি প্রচুর পুলিশ দিয়ে ঘেরা একটি প্রাইভেট কার আর তার ভেতর থেকে তিনচারটি ছেলে আমাকে ডাকছে - খুকুমা খুকুমা এদিকে এসো | আমি যেতে তারা আমার সঙ্গে দুই-চারটি কথা বলে আমাকে খুব সুন্দর গন্ধওয়ালা একটা মালা দিলেন | পরে জানলাম ওটা রজনীগন্ধার মালা। চিনতামও না তখন। সেটা অনেকদিন ধরে ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম | একটু পরে ট্রেনটা যখন চলে যাচ্ছে তখন দেখি ট্রেনের কামরা থেকে তাঁরা আমায় বলছেন- খুকু মা আমরা যাচ্ছি | বড় হয়ে বুঝেছিলাম যে ওঁরা ছিলেন সব পলিটিক্যাল প্রিজনার , এক জেল থেকে ট্রান্সফার হয়ে আরেক জেলে যাচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল এই রকম: একবার রাজশাহী শহরে আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় দেখি এক বিরাট মিছিল ।একেবারে রাস্তা ঠাসা লোক । আর গোটা মিছিলটার সব লোক একসাথে গাইছে - ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।

কেন জানিনা আমার মনে এই দুটো ঘটনা খুব দাগ কেটে বসে আছে।

আমার দাদুদের মা, আমাদের বুড়ো মা, ওখানে আমাদের সঙ্গে থাকতেন। তাই পূজোর ছুটিতে আত্মীয়রা সবাই ওখানে আসতেন। তখন বাড়ির সবাই মিলে বাড়ির মধ্যেই গান নাটক এসব করা হতো। আয়োজনটা কাকা পিসি দিদিরা মিলে করতেন, কিন্তু আমরা ছোটরাও অংশগ্রহণ করতাম।



আমি পড়তাম পি এন গার্লস স্কুলে আর তারপরে রাজশাহী গভর্মেন্ট কলেজে। কলেজে ঢোকার আগেই স্কুলে একটু উপরের ক্লাসে রাজনীতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো। স্টুডেন্ট ফেডারেশন তখন ভয়ানক
জমজমাট। স্টুডেন্ট মেম্বারশিপ থাকার সুবাদে দু-একটা মিটিং এ উপস্থিত থেকেছি। একটা মিটিংয়ে জ্যোতি বসুও গিয়েছিলেন মনে আছে। অবশ্য রাজনীতির বিশেষ কিছুই বুঝিনা তখনও।



পরে কলেজে যখন গেলাম তখন আমাদের সিনিয়র ছাত্রী প্রতিমা দি, প্রতিমা দা শগুপ্ত, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। উনি আমাকে মার্কসিজমের উপর নানা বই পড়তে দিতেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, মেয়েদের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় নানা কথা বোঝাতেন।

ছোটবেলা থেকেই আমার ভয়ানক রাগ - ছেলেরা জন্মালে সাতবার উলু

দেওয়া হয় আর মেয়েরা জন্মালে তিনবার। মেয়েদের ভালো করে মুখেভাত হয় না অথচ ছেলেদের ঘটা করে অন্নপ্রাশন হয়। আমার নিজের



বাড়িতেও এইসব দেখেছি। ছেলে হলেই এই যে বাড়তি সুবিধা পাওয়া - এর উপর ভয়ানক রাগ ছিল আমার। তাছাড়া যেহেতু আমার বাবা ছিলেন না, (বাবা যখন মারা যান তখন মার বয়স ২২ কি ২৩ হবে) আমার মাকেও বেশ খানিকটা নির্যাতিত হতে হয়েছিল। এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করার ইচ্ছে আমার মনের মধ্যে ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল। শুধু আমার মা ই নন, পরিবারে বা তার বাইরেও নানা ক্ষেত্রে মেয়েদের উপর অত্যাচারটা চোখে পড়ছিল। নিজের জীবনেও অনেক অবমাননাকর ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। আর্থিক ব্যাপারে আমরা অন্যদের (কাকাদের) উপর নির্ভরশীল ছিলাম। হয়তো একটা খাতার পয়সা চাইতে গেছি কেউ একটা মন্তব্য করে বসলো, তোমরাই আমাদের ডোবাবে দেখছি। এমনকি মেয়েরাও মেয়েদের কারণে অকারণে দু কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়তো না। মার এই অসহায়তা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ব্যাপারটা কতটা জরুরী। তাঁর হাত খরচের ও কোন ব্যবস্থা ছিল না। খাওয়া পরার কষ্ট হয়নি, কিন্তু তার বাইরেও তো মানুষের কত রকম প্রয়োজন থাকে।

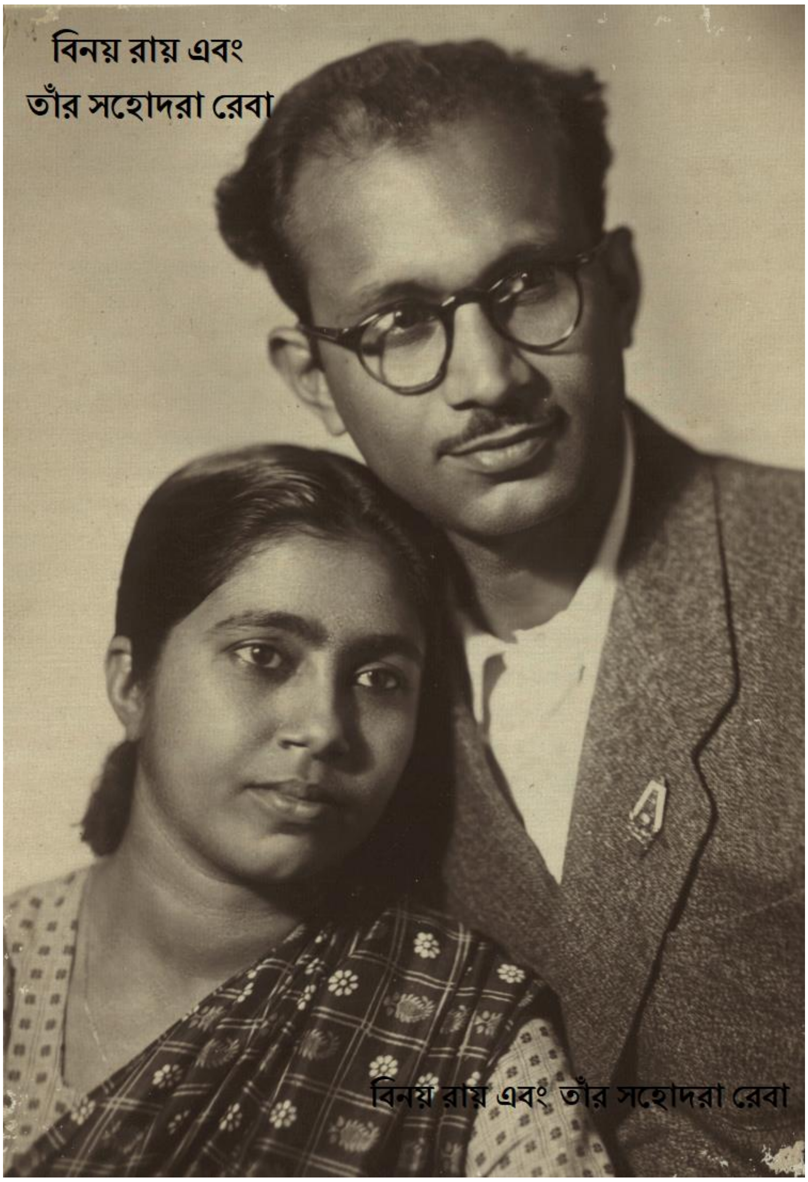
আমি একটু বড় হয়ে দাদুদের বলে মায়ের জন্য কিছু হাত খরচের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেই আন্দোলনের রাস্তায় এসে পড়েছি।

শেষ অব্দি যখন রাজনীতিতে নেমে পড়লাম আমার কাকা সরাসরি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। কলেজে পড়তে পড়তে বিভিন্ন ছাত্রদের দাবি নিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছি, আবার কখনো সোশ্যাল ইসুতে ফ্লাড রিলিফ বা ঐরকম কিছুর জন্য নাটক করা, চাঁদা তোলা, এসব করেছি। দেশের স্বাধীনতার কথা বলা, জনমত তৈরি করাও স্টুডেন্ট ফেডারেশনের কাজের অঙ্গ ছিল। কিন্তু ৪২ সনে পার্টির নির্দেশে আমরা স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করি। কংগ্রেসের ডাকা স্ট্রাইকের দিন পিকেটিং ভেঙে আমরা কলেজে ঢুকেছি। মেঘনাথ সাহার মেয়ে, উষা সাহা আমার সহপাঠী এবং সহযোদ্ধা ছিল। ও সায়েন্স পড়ত আর আমি আর্টস। পিকেট ভেঙে কলেজে ঢোকার জন্য একবার সায়েন্সের ছেলেরা ওকে তিন ঘন্টা ক্লাসের মধ্যে আটকে রেখেছিল।
পার্টি বলেছিল বলেই আমরা অন্ধের মত তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলাম। ভুল করেছিলাম আমরা, ওটা ভুল লাইন ছিল।

মফস্বলে থাকতাম বলে পার্টির কালচারাল,সোশ্যাল, মহিলা -সব ফ্রন্টের কাজই করতে হতো আমাদের। বি.এ. ক্লাসের ফাইনাল ইয়ারে যখন পড়ি, 1943 সনে , তখন বিশাল দুর্ভিক্ষ এসে পড়ল। সে সময় রিলিফ তোলা, গ্রুয়েল কিচেন চালিয়ে অভুক্তদের খিচুড়ি খাওয়ানো, এইসব শুরু হয়ে গেল। তার পাশাপাশি ছিল বস্তিতে ঘুরে ঘুরে মহিলাদের সংগঠিত করা, মহিলাদের মিছিল চালনা করা। তখনও কিন্তু পার্টির মেম্বারশিপ পাইনি। সেকালে এত সহজে মেম্বারশিপ পাওয়া যেত না, অনেক দিন কাজ করে পরীক্ষিত হয়ে তারপরে মেম্বারশিপ পাওয়া যেত এবং পাওয়ার পরে আবার ভয় হতো দায়িত্ব পালন করতে পারবো তো? অনেক কষ্ট করে অনেক

পরে মেম্বারশিপ পেয়েছিলাম।

ওই সময় বিনয়দা (বিনয় রায়) একবার রাজশাহীতে এলেন। উনি সম্পর্কে



আমার দাদাও হন। সেই সময় বিনয় দা বিভিন্ন জায়গায় আইপিটিএর ইউনিট গড়ে তুলছেন। তখনই শুনেছি উনি ৯০ টা গ্রামে ঘুরে এসেছেন। রাজশাহীতে আমাদেরকে নিয়ে ওখানকার ইউনিট করলেন। বিনয় দা আমাদের বাড়িতে গিয়ে গান শেখাতে শুরু করেছিলেন। ওঁর র স্বরচিত গান বেশ কয়েকটি শিখিয়েছিলেন।   তার আগে অবশ্য লিফলেটের আকারে আমরা একটা গান পেয়েছিলাম- জাগো জাগো ভারতবাসী আর কত ঘুমাবি রে। গানটা আমরা প্রভাতফেরীর মতো করে গাইতাম। এটাকে কমিউনিটি সিংগিং এর একটা নতুন

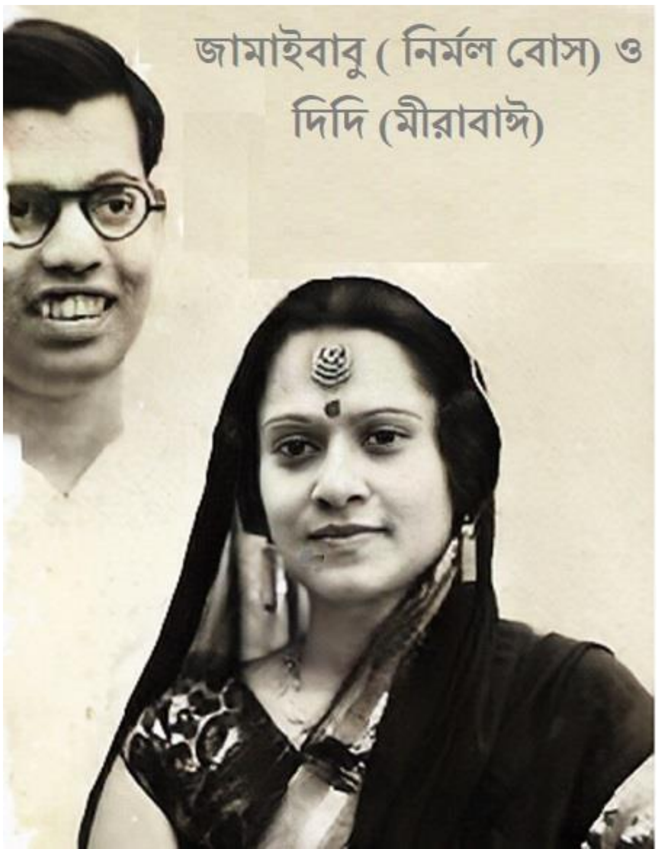
ধারা বলা যেতে পারে। বিনয়দার শেখানো ওই সব গান আমরা স্কোয়াড করে মিটিং মিছিল ময়দানে গাইতাম। আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব গানও গাওয়া হতো। গান গাওয়া ছাড়া কৃষক বা ছাত্র সমস্যা নিয়ে লেখা ছোট ছোট নাটিকায় অভিনয় করতাম। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে কিছুটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ই আমরা এই কাজগুলো করতাম।

পারিবারিক বিরোধটা কিন্তু অব্যাহত ছিল। অনেকে এসে কাকাদের কাছে অভিযোগ করতেন বড়লোক বাড়ির অল্পবয়সী অবিবাহিত মেয়ে এখানে ওখানে রাতবিরেতে ট্যাং ট্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মিটিং করছে এটা কি ঠিক ? কাকারাও ভয় দেখাতেন - তোমাকে মার লাগাতে হবে। তুমি কথা শুনছো না, এসব ছেড়ে দিচ্ছ না। প্রায়ই বাড়ি ফিরতে রাত হতো। মেয়েদের মিটিং মিছিলে আনবার জন্য তাদের বাড়ির কাজও করে দিতে হতো। কাজ শেষ না হলে তো বাড়ির ছেলেরা তাদের ছাড়বে না। হয়তো মারধোরও করবে। খুবই ব্যাকওয়ার্ড ছিল তো রাজশাহী।

রাত করে বাড়ি ফিরতাম, সেজন্য অনেক কুৎসারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাত্রে আমার ফেরার সময় সমস্ত দরজায় তালা লাগিয়ে দিতেন কাকারা যাতে ঢুকতে না পারি। শুধু মেইন গেটটা খোলা থাকতো। সেখানে নিজেরা উপস্থিত থাকতেন ওঁরা, কখন ফিরি তা দেখার জন্য। আমার ঘর ছিল একটা টিনের শেড দেওয়া গ্যারেজের ওপরে আর সেটার পাশে একটা বেঞ্চি রাখা থাকত। আমি ওই বেঞ্চের উপর পা রেখে টিনের চালে উঠে পাচিল টপকে আমার ঘরে ঢুকে পড়তাম। মা অবশ্য আমাকে সাহায্য করতেন, আমার খাবার রেখে দিতেন ঘরে। মাঝে মাঝে মেইন গেটও বন্ধ

হয়ে যেত। তখন আরও বিপদ। দুই একজন দারোয়ান কাকাদের লুকিয়ে কখনো কখনো দরজা খুলে দিত।

একটা মজার কথা বলি। বিনয়দা বাড়িতে গান শেখাচ্ছেন, হঠাৎ এক কাকা নিচে ডেকে পাঠিয়ে বললেন এসব পার্টির গান তুমি এ বাড়িতে বসে গাইতে পারবে না। আমি তখন গাইছিলাম - এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন। বললাম পার্টির গান নয় ওটা রবীন্দ্রনাথের গান। রবীন্দ্রনাথের উপর ভীষণ দুর্বলতা তাই তখন আর কিছু বলতে পারলেন না এরকম করেই পার্টি করতাম কিন্তু শেষের দিকে আর সহ্য করতে না পেরে এক কাকা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়ে পড়লেন কমিশনার হওয়ার জন্য; হিন্দু মহাসভার সাহায্য নিয়ে কম্বল টম্বল বিলি করে জিতেও গেলেন। আর সেই রাত্রে রাত বারোটার সময় আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কি স্লোগান। অবশ্য কাকার বিরুদ্ধে বলতে হবে বলে আমি সেবার ক্যাম্পেন করিনি। পার্টি থেকেও সেটা মেনে নিয়েছিল। বাড়ির মধ্যে এভাবেই লড়তে হয়েছিল। মা প্রথমে আপত্তি করলেও পরে নিজেই মহিলা সমিতি করতেন। মাকে অনেক দিন ধরে বুঝিয়েছিলাম।



বি.এ.পাশ করলাম।

রাজশাহীতে এম.এ. পড়ার সুযোগ নেই। কলকাতাতেও আসতে দিল না আমাকে। চোখের সামনে থেকে চলে গেলে আরো বেশি করে রাজনীতি করব এই আশঙ্কা ছিল অভিভাবকদের। আমি একটু

কৌশল করেই রংপুরে চলে এলাম আমার দিদি জামাইবাবুর কাছে। আমি একা একবার কলকাতা গিয়েছিলাম শ্যামাপ্রসাদের ফুড কনফারেন্স এর সময়। মা এসে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজশাহীতে রটে গেল আমি পালিয়ে গিয়েছি। আমি জানতাম এরকম কিছু ঘটতে পারে তাই কলকাতায় এসে আমার এক কাকার কাছে উঠেছিলাম। অবশ্য সেইবার ওখানকার মেয়েরা প্রতিবাদ করে বলেছিল যে না আমরা জানি ও ভালো কাজে গেছে। কয়েকজন সচেতন পুরুষ ও কুৎসার প্রতিবাদ করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘ গঠিত হওয়ার পর তার বিভিন্ন ইউনিটের গান শিখে নিয়ে গাইতাম।   কিছু কিছু গান ইউনিটের লোকেরাও তৈরি করতেন।কৃষক শ্রমিকদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে রচনা করা গানও গেয়েছি।   কৃষক কবিয়াল রমেশ শীল বা মারাঠি শ্রমিক কবি আন্নাভাই শাঠে র অনেক গান আমরা গেয়েছি।



এর আগে প্রথাগতভাবে গানটা শেখা হয় নি , রেডিও বা রেকর্ড থেকে শুনে শিখে নিয়ে গাইতাম। বোম্বে যাওয়ার আগে তো কোনদিন তানপুরাও ছুঁইনি। পঙ্কজ মল্লিক, শচীন দেব বর্মন, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় - এদের গান শুনে শিখে চিৎকার করে গাইতাম। দিদি রাধিকা মোহন মৈত্রের কাছে সেতার বাজাতে শিখত। উনি কিছুদিন এক গানের কম্পিটিশনের জন্য কিছু

গান আমাকে শিখিয়েছিলেন। গানের সময়ও দিদি বাজাতো মা বাজাতো এই করে হারমোনিয়াম বাজানো টাও শেখা হয়নি আমার।

পার্টিতে আমার নেতা ছিলেন অবনী লাহিড়ী। তাঁর সুবাদে আলাপ হলো রমেন ব্যানার্জীর সঙ্গে। পরে ১৯৪৭ সনে তাঁর সাথেই আমার বিবাহ হয়। উনি পার্টির কাজে আমাদের ওখানে যেতেন ; ওনাদের এক আত্মীয়ও থাকতেন আমাদের লাগোয়া বাড়িতে। তাই ওঁর সঙ্গে মাঝেমধ্যেই দেখা হতো। উনি একবার বম্বে ঘুরে এসে বললেন, বিনয় বোম্বেতে সেন্ট্রাল স্কোয়াড করছে ,ওদের গানের লোক নেই, তুমি লেখ যে তুমি যেতে চাও। আমি সেই মতো বিনয়দাকে লিখলাম। বিনয়দা মারফত খবর পেয়ে


রমেন ব্যানার্জী

যোশী (পি সি যোশী) ব্যাপারটা নিজের হাতে নিলেন। ওঁর অসম্ভব উৎসাহ ছিল সেন্ট্রাল স্কোয়াড এর সমস্ত বিষয়ে। উদয় শঙ্করের সেন্টার থেকে স্কোয়াডে যোগ দিয়েছিলেন অবনী দাশগুপ্ত। তিনি এসে আমার গান শুনে আমাকে নির্বাচন করলেন। তখন আবার রাজশাহীর মহিলা নেত্রীরা আমাকে ছাড়বেন না। শেষে যোশী টেলিগ্রাম করলেন, ভবানী সেন নেত্রীদের বোঝালেন তারপর আমি ছাড়া পেলাম। অবশ্যই গানের আকর্ষণে আমারও যাবার ভীষণ ইচ্ছে ছিল।

আইপিটিএ তখন অনেক ছড়িয়ে গেছে। সারাদেশে গান নাচ নাটকের অনেক টুকরো টুকরো ইউনিট । ৪৫ নাগাদ ঠিক হয় একটা অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল ব্যালে ট্রুপ তৈরি করা হবে। সেটাই সেন্ট্রাল স্কোয়াড। নাচ গানের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে অনেক সহজে পৌঁছানো যাবে এই ভেবেই বোম্বের আন্ধেরিতে সেন্ট্রাল ট্রুপ গড়ে তোলা হয়। সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে তাতে লোকেরা এসেছিলেন – সব পার্টির ছেলে মেয়ে, কেউ নাচতেও



ডান দিক থেকে : রেবা [রায় চৌধুরি], প্রীতি [ব্যানার্জী] ,রুবি দত্ত,শান্তা গান্ধী, রেখা জৈন
বাঁ দিক থেকে : গুল বর্ধন, দীনা গান্ধী ; [পরের কিশোরীটি এবং ডান প্রান্তের শিশু দুটির পরিচয় অজানা]

জানে না তেমন কিছু গানও জানে না। উদয় শঙ্করের দল তখন ভেঙে গেছে। সেখান থেকে শান্তি বর্ধন, শচীন শংকর আর দেবেন শর্মা আমাদের ট্রুপে যোগ দিলেন। ঢোল এবং অন্য তালবাদ্য বাজাতেন অবনী দাশগুপ্ত। তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। আমি শুনেছি আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রবল নিষ্ঠা দেখে ওঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আমরা তো ঠিক তৈরি শিল্পী ছিলাম না, ওনারাই তৈরি করে নিয়েছিলেন ।

বোম্বেতে গিয়ে দেখি ‘স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া‘ নৃত্যনাট্যের কম্পোজিশন হয়ে গেছে, দিন পনের পরেই অনুষ্ঠান করতে হবে। নাচ কম্পোজ করতেন শান্তি দা আর অবনী দা গান। প্রথম বছর আমাদের সব গানের সুর ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পল্লীগীতি থেকে নেওয়া। আমি গিয়ে ওই ১৫ দিনের মধ্যেই গানগুলো তুলে নিয়ে ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তখনই প্রথম অভিজ্ঞ পেশাদার শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে তানপুরা নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে রেওয়াজ করতে শিখলাম।

যোশী বলতেন, এখন রেওয়াজ করা নাচ অনুশীলন করা এগুলোই তোমাদের পার্টির কাজ। কলকাতা দিল্লি পাটনা এলাহাবাদ


কল্পনা দত্ত (যোশী) এবং পি সি যোশী [১৯৪০ এর দশকে]

আহমেদাবাদের মত শহরে এবং ছোট ছোট গ্রামেও পার্টি আমাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করত, আমরা শো করতে যেতাম । প্রবল ভীড় হতো, হাউসফুল। খোলা মাঠে, হলের ভেতরে - সব জায়গায় আমরা স্পিরিট অফ ইন্ডিয়ার শো করেছি। দেখানো হতো ব্রিটিশরা কিভাবে দাঙ্গা বাধাচ্ছে আর কিভাবেই বা আমাদের তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে ।

ফিশারম্যান বলে মৎস্যজীবীদের জীবনের ওপর, কালেক্টিভ ফার্ম ,
লামবার্ডি - এসবের ওপরও ছোট ছোট আইটেম ছিল।
দুর্ভিক্ষের ওপর 'শি ডায়েড অফ হাঙ্গার ' বলে একটা কম্পোজিশন শচীন তৈরি করেছিল।
গানের ব্যাপারে বাংলার ভার ছিল বিনয় দার ওপর। বাংলা গান সবই তিনি লিখতেন আর হিন্দি গান প্রেম ধাওয়ান । গান গাইতাম আমি বিনয়দা আর রেড্ডি। নাচের দলে অনেকেই ছিল - রেবা , সুন্দরাইয়া স্ত্রী লীলা, দীনা পাঠক, দীনার বোন শান্তা গুনিয়েল জাবেরী ইত্যাদি। আমাকেও নাচে নিয়ে নিয়েছিল।   অবনীদা রাগ করে বললেন যত মেয়ে আসে শান্তি সব নাচে নিয়ে নেয়। তারপর থেকে আমি শুধু গাইতাম।



সহকর্মীদের সঙ্গে **প্রীতি বন্দোপাধ্যায়** (সামনে ডান দিকে) , (তাঁর পেছনে) **জয়া রায়** [বিনয় রায়ের স্ত্রী] এবং (ওপরে মাঝখানে)   **রেবা রায় চৌধুরী**



IPTA শিল্পীরা নিজেদের costume তৈরি করছেন
ডান দিক থেকে প্রেম ধাওয়ান, প্রীতি ব্যানার্জি , রেবা রায় চৌধুরী

নাচে ছেলেদের মধ্যে ছিল নাগেশ, শচীন, শর্মাজী, আপ্পুনি, গঙ্গাধরন, প্রেম ধাওয়ান ইত্যাদি। চিত্তদা - চিত্ত প্রসাদ - আমাদের সমস্ত পোশাক, মাস্ক এঁকে দিতেন | একটা বিরাট বাগান বাড়ির মত বাড়িতে আমরা সবাই থাকতাম। চিত্তদা অবশ্য একটু দূরে থাকতেন। ওই বাড়িটাতেই আমাদের থাকা খাওয়া অনুশীলন রেওয়াজ সবকিছু। পার্টির ছেলেরা এবং শিল্পীরা সবাই মিলে ঐ কমিউনেই জীবন যাপন করতাম।

তখন পার্টির রাজনৈতিক কর্মী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে তফাত খুবই কম ছিল। সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বাররা আসতেন আমাদের শো দেখতে। যোশীর তো তুলনাই হয় না - স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া স্ক্রিপটা উনিই কম্পোজ করেছিলেন। তখন পার্টির হেডকোয়াটার্স বোম্বেতেই ছিল। নেতারা

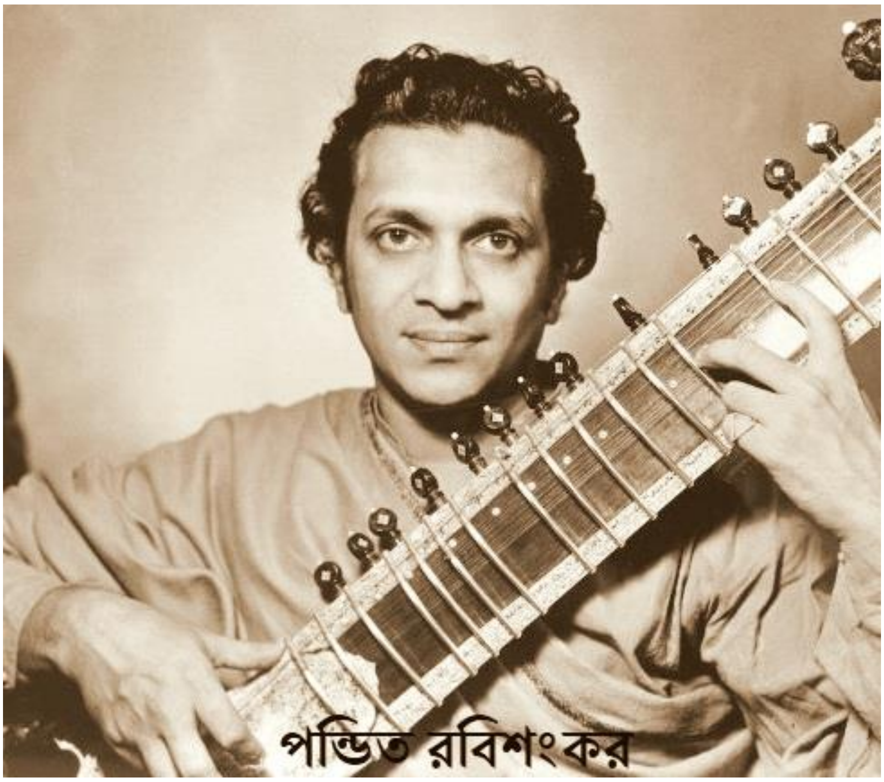
অনেকেই আসতেন, আমাদের ক্লাস নিতেন। জেনারেল বডি মিটিং হলে আমাদেরও যেতে হতো। যে যার মতো ঘরের কাজও করতে হতো। আবার পার্টির কাগজও বিক্রি করতে হতো অবসর সময়ে। একটা দিন শুধু ছুটি থাকতো- রবিবার। কিন্ত পরের দিকে সেটাও আর পাওয়া যেত না।


জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

একবার হঠাৎ বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) গিয়ে হাজির ওখানে। আমরা তো খুব খুশি। রোজ রাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পরও বটুকদা, বিনয়দা আর শান্তি দা গুজগুজ করতেন।   তারপরে একদিন দেখি হর-পার্বতীর ঝগড়া নিয়ে বটুক দা "গাজন" কম্পোজ করেছেন। পরে সেটাও আমরা স্টেজে করতাম।
এদিকে বটুকদার বাড়িতে ছেলের তখন নিমোনিয়া। বটুকদা কোথায় বৌদি কিছুই জানেন না। একমাস পরে তাঁরা বোম্বে থেকে চিঠি পেলেন যে বটুকদা সেখানে। এরকমই পাগল মানুষ ছিলেন বটুকদা। সৃষ্টির নেশায় আর সবকিছু ভুলে বসে থাকতেন।

১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে তার বিরোধিতা করার ফলে আমাদের পার্টি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আইপিটিএ আন্দোলন এবং বিশেষ করে সেন্ট্রাল ট্রুপের

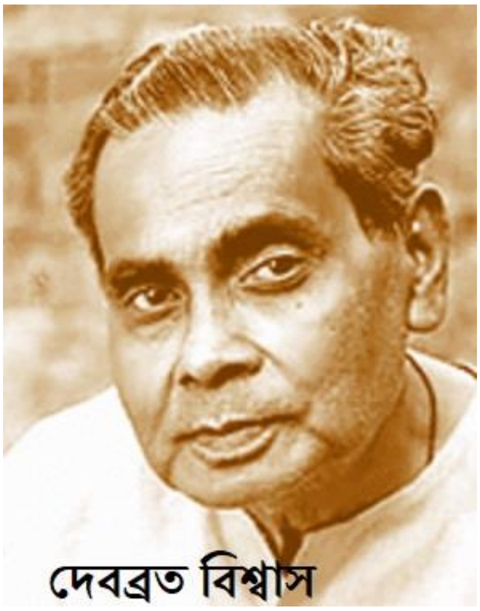
এইভাবে মানুষের মধ্যে গিয়ে শো করা সেই বিচ্ছিন্নতা কাটাতে বেশ খানিকটা সাহায্য করেছিল বলে আমার মনে হয়। দুর্ভিক্ষের সময়কার কাজ এবং এই জাতীয় সাংস্কৃতিক কাজ পার্টিকে আবার জনগণের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিল অনেকটাই। শুধুমাত্র গান হিসেবে বিচার করলে স্পিরিট অফ ইন্ডিয়ার গানগুলো কতটা উচ্চমানের বলে মনে হবে তা আমি জানিনা। কিন্ত ব্যালের সঙ্গে মিলে সেটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল বলে আমরা দেখেছি। শান্তিদার অসামান্য কোরিওগ্রাফি গানগুলোতে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। পরের বছর ১৯৪৬ এ রবিশংকর এসে যোগ দেওয়াতে ক্লাসিক্যাল কম্পোজিশনের দিকে ঝোঁক টা বাড়ে। ওই সময় ইকবালের ,"সারে জাহাঁ সে আচ্ছা" তে সুরারোপ করার জন্য আমরা রবিশংকরকে অনুরোধ করি।



এখন যে সুরে ওটা সর্বত্র গাওয়া হয় সেটা ওই সময় রবিশঙ্করেরই করা। সুর করা হয়ে গেলে আমি ওঁর কাছে গিয়ে সেতার থেকে গানটা গলায় তুলে নিই এবং ফিরে এসে ট্রুপের আর সবাইকে শেখাই। শেখার সময় শুধু তানপুরা বাজিয়ে শেখা হতো। পরে অনুষ্ঠানের সময় বেহালা, তবলা, ঢোল ও যোগ হতো। পরে কলকাতায় পরিবেশন এর সময় সাথে সলিল

বাঁশি বাজাতো।

সারে জাহাঁ সে আচ্ছা আমরা গলায় তুলে নেওয়ার পরে রবিশঙ্কর একদিন এলেন কিভাবে কোরাসে গাইতে হবে সেটা শিখিয়ে দিতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার - চারি; সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিলেন উনি। চারি সাজেস্ট করলেন " হিন্দি হ্যায় হাম" এই অংশটা ৩ বার গাইতে । রবিশংকর সেই পরামর্শ গ্রহণ করলেন।
সারা ভারতে বিভিন্ন জায়গায় গেয়ে গেয়ে ওই গানটা আমরাই ছড়িয়ে দিয়েছি। ওটা আমাদের ওপেনিং সঙ ছিল। সেন্ট্রাল ট্রুপ ভেঙে যাওয়ার পরে কলকাতায় গানটার রেকর্ডিংও হয়েছিল। তাতে বিনয়দা, জর্জদা,রেবা এবং আমি ছিলাম। একটা সময় অব্দি এই রেকর্ডটা রেডিওতে প্রায়ই বাজানো হতো।


দেবব্রত বিশ্বাস

সেন্ট্রাল ট্রুপের অনুষ্ঠান যখন কলকাতায় হত তখন জর্জদা গাইতে আসতেন রোজ, আর আসতেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। রংমহলে শো হতো আমাদের । উনি তার খুব কাছেই থাকতেন। বিভিন্ন সময়ে কলকাতায় আমাদের অনুষ্ঠান দেখে গিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক , দিলীপ রায়, শান্তিদেব ঘোষ - এঁরা সবাই। প্রশংসাও করেছিলেন।

সে সময়ের অনেক বড় বড় শিল্পী ,তা তিনি কমিউনিস্ট হোন বা না হোন, গণনাট্য সংঘের কাজে যোগ দিয়েছিলেন । সংঘের প্রতি তাদের আকর্ষনের

কারণটা সবসময় যে রাজনৈতিক ছিল তা নয়। শান্তিবর্ধন কমিউনিস্ট ছিলেন না। রবিশঙ্করও নয় - কিন্ত অনুষ্ঠানের পর কোন কোন দিন রাত তিনটে অব্দি আমাদের সেতার বাজিয়ে শুনিয়েছেন । সরাসরি শিখিয়েছেন ও অনেক কিছু। গণনাট্যের শিল্পী মন তৈরির কাজে এগুলো খুবই সহায়ক হয়েছিল। এর ফলেই গণনাট্য সংঘ সারা ভারতবর্ষে উচ্চমানের এক শক্তিশালী সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিল।

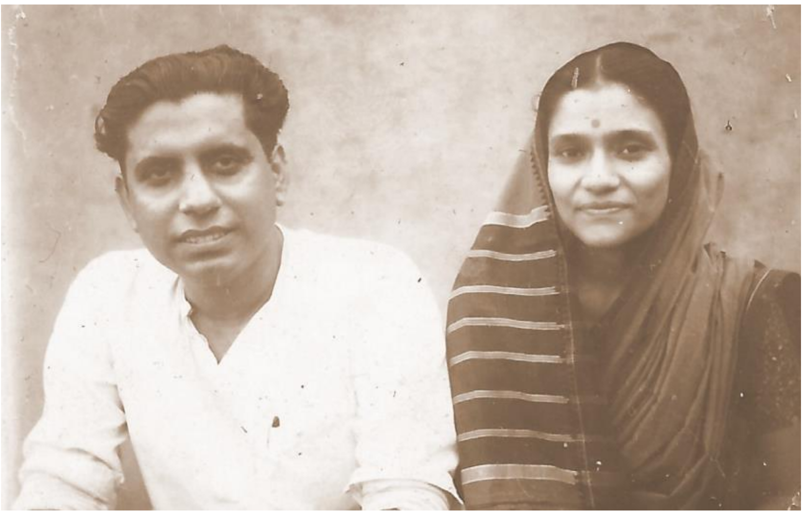
দিল্লিতে অনুষ্ঠান করার সময় ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এলো। রজনী পাম দত্ত এসেছিলেন আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে, সরোজিনী নাইডুও মাঝে মাঝেই আসতেন। ভারতের ইতিহাসের ডেপিকশনটা ওঁর খুব পছন্দ ছিল। আবার এর উল্টো দিকে বাধাও আসত অনেক । বম্বেতে RIN mutiny র ওপর আমরা একটা ব্যালে করেছিলাম ১৯৪৬ সালে। তাতে 'জনগণমন' গাওয়া হত। ব্রিটিশ সরকার গান সমেত পুরো ব্যালেটাই নিষিদ্ধ করে দিলেন। আমরা নাম পাল্টে পাল্টে ব্যালেগুলো করতাম ।



শান্তিনিকেতনেও আমাদের অনুষ্ঠান করতে যাওয়ার কথা ছিল। যাওয়ার সব ঠিক, এমন সময় লিফলেট বিলি করে অনুষ্ঠানটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। পূর্বোক্ত নৌ বিদ্রোহের বিষয়ে আইটেমটা নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পরে আমাদের কেউ হল ভাড়া দিত না। আমরা আমাদের ওই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই মাটি আর কাঠ দিয়ে স্টেজ তৈরি করে সেখানে অনুষ্ঠান করতাম। ৪৭ এর গোড়ায় সেন্ট্রাল ট্রুপ ভেঙে গেল । তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে তখন বহু জায়গায় আইপিটিএ র ইউনিট এবং আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কাজেই যে প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে সেন্ট্রাল ট্রুপ করা হয়েছিল তার অনেকটাই তখন আর নেই। দ্বিতীয়ত এক জায়গায় বসে , মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কেবল কম্পোজ করা আর পারফর্ম করা এটা খুব বেশি দিন করে যাওয়া যায় না। কাজটা বেশ শক্ত বলেই আমার মনে হয়। তৃতীয়ত ট্রুপের শিল্পীদের কেউ কেউ পার্টির, বিশেষত যোশীর, হস্তক্ষেপে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। যোশী তখন ট্রুপ ভেঙে দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন । আমার সামনে যোশীকে বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন শর্মাজী। তিনি বলছিলেন, যোশী তুমি ভেঙে দিও না। ভারতবর্ষে কোথাও কেউ এতদিন ধরে এতজন শিল্পী কে একসঙ্গে ধরে রাখতে পারেনি। যোশী কিন্ত ভেঙেই দিলেন। ওনার হয়ত মনে হয়েছিল এর রাজনৈতিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে ।

তারপর কলকাতায় এসে এখানকার আই পি টি এতে যোগ দিলাম। সেখানে তখন জর্জদা, বটুকদা, সলিল সবাই ছিলেন।

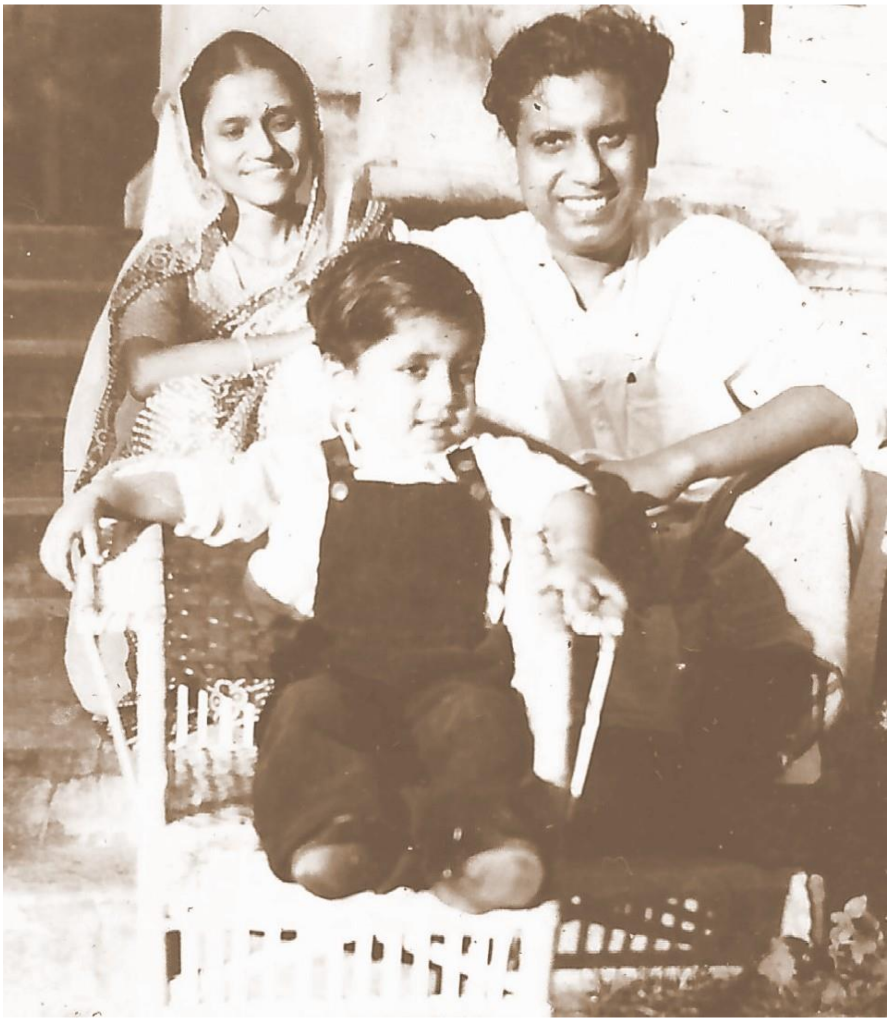
তারপর ১৯৪৭ এ বিয়ে হয়ে গেল। চাকরি করতে শুরু করলাম বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ। ওখানে ৩০ বছর চাকরি করেছি। পরে



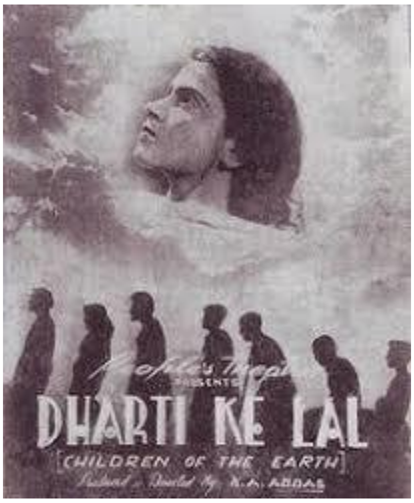
মেম্বারশিপও ছেড়ে দিতে হলো । চাকরি করে আর পারতাম না। সেই সময় আমাদের বাড়ি থেকে চারজন হোল টাইমার । আমি, আমার কর্তা ,আমার বড় দেওর এবং তার স্ত্রী। একমাত্র শ্বশুর মশাই ওকালতি করে যা রোজগার করতেন। অথচ পরিবারে রয়েছেন আমার শাশুড়ি এবং আরো দুই দেওর। চাকরি না করে তাই উপায় ছিল না। আমার মাও তখন পরিবারের আরোঅনেকের সঙ্গে রাজশাহী থেকে দমদমে চলে এসেছেন। এতগুলো লোকের চলবে কি করে? তাই চাকরি নিতে হল। আমার বড় দেওর নৃপেনও হোল্টাইমারি ছেড়ে কুলটিতে মাস্টারী নিয়ে চলে গেল। কলকাতায় এসে বিয়ের পর শোভাবাজারে থাকতাম। শ্যামবাজারে বঙ্গীয় কলালয় নামে একটি অফিস ঘরে গণনাট্যের মহড়া হতো। তখন আমরা প্রধানত বটুকদা আর সলিলের গানই গাইতাম।

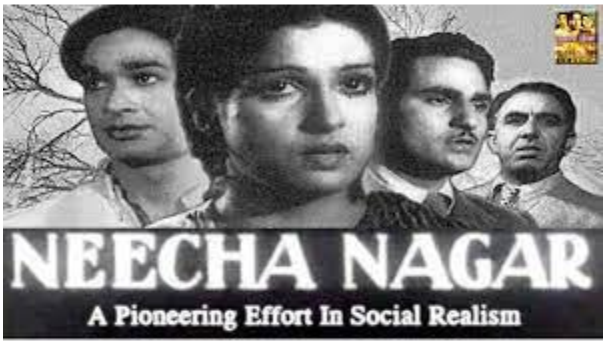
এভাবেই নবজীবনের গান গাইতে শুরু করি।
নবজীবনের গান তখন সাধনা রায়চৌধুরী , ভূপতি নন্দী এবং জর্জদা ও গাইতেন। স্বাধীনতার পর কিছু নতুন গান রচনা করা হলেও পুরনো গানগুলো বাদ পড়েনি, সেগুলো ও গাওয়া হতো ।

৪৯ এর পর থেকে গণনাট্যের কার্যকলাপে কেমন যেন ভাটা পড়ে এলো। পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর যোগাযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রেও অসুবিধে দেখা দিল। এই সময়কার কথা আমি খুব ভালো বলতে পারব না কারণ চাকরি নেওয়ার ফলে আমি তখন আর খুব বেশি সময় দিতে পারতাম না পার্টি বা আই পি টি এর কাজে।



সিনেমাতে কিছু কিছু গান গেয়েছি। বোম্বেতে খাজা আহমেদ আব্বাসের ধরতি কে লাল ছবিতে গান গেয়েছিলাম, খুব অল্প সময়ের জন্য অ্যাপিয়ারও করেছিলাম - ওতে আমার দুটো ডায়ালগ ছিল। ম্যাক্সিম গোর্কির কাহিনী অবলম্বনে চেতন আনন্দ বানিয়েছিলেন নীচা নগর, তাতেও প্লেব্যাক করেছি।



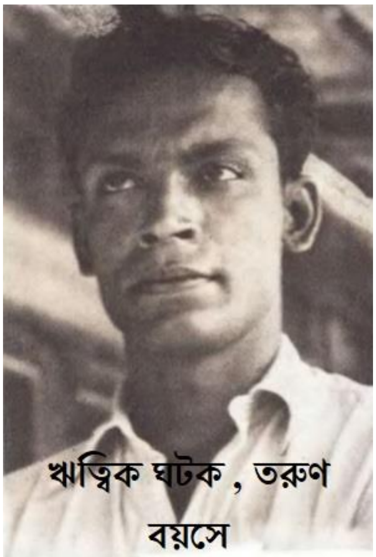


(চেতন আনন্দ হলেন বিখ্যাত অভিনেতা দেব আনন্দের দাদা। ওর এই ছবিটি ফ্রান্সের কান ফেস্টিভালে পুরস্কৃত প্রথম ভারতীয় ছবি। ১৯৪৬ সালের First CANNES Festival এ ছবিটি Grand Prix পুরস্কার পায় ..... সংকলক)।

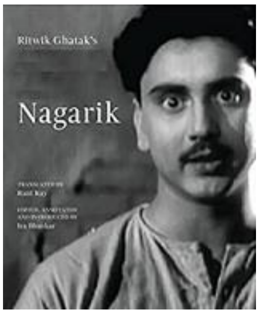
পরে কলকাতায় এসে পঙ্কজ মল্লিক এর পরিচালনায় বিমল রায়ের অঞ্জনগর ছবিতে গান গেয়েছি। সলিলের পরিচালনায় পরিবর্তন,বরযাত্রী ও পাশের বাড়ি ছবিতেও। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত পুতুল নাচের ইতিকথা ছবিতেও আমার গান আছে।



ঋত্বিক এসে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত ওর ছবিতে গান গাইবার জন্য। ওর প্রথমতম ছবি নাগরিক এ প্লেব্যাক করেছি। অন্য গানের সঙ্গে কয়েক কলি পদাবলী কীর্তন !! কোমল গান্ধারে প্রধানত নবজীবনের গান গেয়েছি।



ঋত্বিক ঘটক , তরুণ বয়সে



এছাড়াও গেয়েছি লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে বানানো আমার লেনিন ছবিতে। এগুলো সবই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গীত পরিচালনায় ; ওনারই পরিচালনায় কুমারী মন বলে আরেকটি ছবিতে গেছিলাম- রবীন্দ্রসংগীত। জর্জদার সঙ্গে রবীন্দ্র সংগীতের ডুয়েট আছে ওই ছবিতে।

বোম্বেতে থাকতে প্রায় সারাদিনই গান গাইতাম। ভোরের আলো দেখা যেত যখন তখন থেকে রেওয়াজ করতাম। তারপর অনুশীলন। দুপুরে চাল টাল বাছা, ঘরের কাজ। তারপরেই রবু দা (রবিশংকর) ডাকতেন। তিনি যা যা কম্পোস করতেন- স্কোয়াডের গান, ফিল্মের গান- সব গলায় তুলতে হতো। পরে ওঁর আর মনে থাকতো না। ওঁর ই কাছে ক্লাসিক্যাল গানের বিরাট



জগতের সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয় হয়েছিল। এই করে দিনে প্রায় ঘন্টা

দশেক গান গাইতাম। কিন্তু কলকাতায় এসে দশটা পাঁচটা করে এত ক্লান্ত হয়ে যেতাম যে আর ওরকম গাইতে পারতাম না। তবুও মাঝে মাঝে অফিস কামাই করে ও গাইতে যেতাম। ১২ বছর রেডিওতে গান করার পর রেডিও ছেড়ে দিলাম। ঋত্বিক হঠাৎ



হঠাৎ এসে তার ছবির জন্য গান গাইতে নিয়ে যেত একথা তো আগেই বলেছি। সব গান পুরো গাওয়াতো কিন্তু দিত এক লাইন দু লাইন। আমি বলতাম দেন তো এক লাইন দুই লাইন কিন্তু খাটিয়ে মারেন। সম্পূর্ণ গান গুলির কোন রেকর্ড (এলবাম) নেই । সেগুলো হরিয়েই গেছে।

গণনাট্যের শুরু হয়েছিল ৪৬ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে – ওটা যেন গণনাট্যের প্রসব যন্ত্রণা । তার সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। এই কারণগুলো অপসারিত হওয়ার পর বোধহয় তাগিদ কিছুটা কমেছিল। গণনাট্য আন্দোলনে ভাটা পড়ার পেছনে রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুই কারণ ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমি তখন আর সংঘের সঙ্গে ওতোপ্রত ভাবে জড়িত ছিলাম না বলে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা বিশ্লেষণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দুর্ভিক্ষের সময় বা তারপরে গণনাট্য আন্দোলন খুবই কার্যকরী হয়েছিল ।   নানা জায়গায় লোকে আমাদের গান শুনে অনুপ্রাণিত

হয়েছে, কেঁদেছে ,আন্দোলনে সামিল হয়েছে। বরিশাল কনফারেন্সে



গেছি- নিজেরাই রাজনৈতিক বিষয়ে গান বেধে   বাউল সেজে গান গাইছি , পয়সা তুলছি ।   একজন লঞ্চের মধ্যে বললেন এরা মিথ্যে বলে পয়সা তুলছে। আমরা গান গাওয়ার পর সবাই পয়সা দিলো ওই ভদ্রলোকও দিতে এলেন আমরা তখন বললাম কিছুতেই নেব না আপনার পয়সা। দাঙ্গার এলাকাতেও গেছি - লোকে শুনেছে । এই সব থেকে বুঝেছি যে সত্যিই জনমানসে একটা অভিঘাত হতো।

আর আমার নিজের প্রাপ্তি রবীন্দ্র সংগীত।



জর্জ দা নিজে শিখিয়েছিলেন। বিশ্ব প্রকৃতিকে খুঁজে পেয়েছি তার মধ্যে। জেলে থাকার সময় গীতবিতান চাওয়াতে অনেক সেন্সর করে ছাপটাপ মেলে সেগুলো দিয়েছিল। এখন আর পারি না তবু গাইতে ইচ্ছে করে - ইচ্ছে করে রবীন্দ্র সংগীত গাইতে।।